বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

রাজনৈতিক-অর্থনীতি

যোগাযোগে রাজনীতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্যতা

সাজ্জাদ জহির | ০০:০০:০০ মিনিট, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৫

অর্থনীতির দুটো মৌলিক ধারণা এ প্রবন্ধের বর্ণনাধর্মী বিশ্লেষণে ভূমিকা রেখেছে— (১) যোগাযোগ-প্রকল্পের ধরন দেখলে তার অন্তরালের আর্থসামাজিক গোষ্ঠী ও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব (ডুয়্যালিটি) এবং (২) এসব প্রকল্প বাছাই ও বাস্তবায়নে মুখ্য চালিকা শক্তি থাকে, যদিও প্রতিটি স্তরে একাধিক শক্তির দরকষাকষি চূড়ান্ত ফলাফলে প্রভাব রাখে। একচেটিয়া বাজারের আলোচনায় এ জাতীয় প্রয়োগ দেখা যায়। বাজারের ভৌগোলিক সীমানা যখন বাঁধা থাকে (সসীম বা finite), সেই সীমানার একাধিপত্যবাদকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণে তৃতীয় একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংযুক্তির ফলে বাজারের সীমানা যখন বাঁধা থাকে না, তার পরিধি যখন বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত হয়, তখন অধিক শক্তিশালী (দেশের ঊর্ধ্বের) স্বার্থান্বেষী মহল নির্দিষ্ট কোনো দেশের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ যুক্তিকাঠামোয় থেকে যোগাযোগ খাতের সঙ্গে ভিন্ন ভৌগোলিক সত্তার সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বর্ণনা দেব এবং চলমান উদ্যোগের ভিত্তিতে কিছু পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করব।

শিল্পনির্ভর নৈতিক অগ্রগতির মূলে রয়েছে জ্বালানির মালিকানা ও তার ওপর কর্তৃত্ব। আর পাঁচটা সম্পদশালী দেশের মতো বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে জ্বালানি খাতের সংশ্লিষ্টতা বহুল আলোচিত নয়। সত্তরের দশকজুড়ে এবং আশির দশকের গোড়া অবধি একটার পর একটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নেপথ্যের কাহিনী আজো রহস্যাবৃত।

১. ষাটের দশক থেকেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গ্যাস উত্তোলনের চুক্তি শুরু হয়েছিল (এবং কথিত আছে, জ্বালানি তেল পাওয়া গেলেও কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি)। ২. আশির দশকে (এরশাদ সরকারের আমলে) কাফকো সার কারখানার জন্য আন্তর্জাতিক বাজার দামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দামে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি করা হয়েছিল। ৩. নব্বইয়ের দশকে ভূগর্ভ থেকে গ্যাস উত্তোলনে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির আওতায় যৌথ খরচ নিরূপণ কমিটির সদস্যরা এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরা (সামষ্টিক বিচারে) অতি নগণ্য ব্যক্তি-লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের (বিশাল পরিমাণ) স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিল মর্মে জনমত প্রকাশ পেয়েছিল। ৪.সহস্রাব্দের শেষ কয়টি বছরে আকস্মিকভাবে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত মজুদের ধুয়ো তুলে, এ দেশের খরচায় পাইপলাইন নির্মাণ করে গ্যাস রফতানির প্রস্তাব উঠেছিল। ৫. নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই অবশ্য জ্বালানি সংকটের প্রকটতা সম্পর্কে জানানো হয় এবং কয়লা ও জ্বালানি নীতিতে দীর্ঘ স্থবিরতার যুক্তিতে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ লক্ষ করি। (১)

নানা বিবাদ নিরসনে দীর্ঘসূত্রতার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমাগত অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। দুই বছরের (২০০৭ ও ২০০৮) বিরল শাসন ব্যবস্থায় অনেকগুলো জড় পদার্থ যেমন দূর হয়েছে, তেমনি অনেক সম্ভাব্য দেশজ পুঁজি গঠনের ধারা ব্যাহত হয়েছে।

সেসঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের ফাঁকে নিঃশব্দে খনিজ বালু আহরণের অধিকার বিদেশী সংস্থাকে দেয়া হয়। ২০০৯-এর পর নতুন সরকারের উদ্যোগে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিরসন সবার মনে সাময়িক আশা জাগিয়েছিল এবং তাদের আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো পরিকল্পনায় অনেকের মনে নতুন উন্নয়ন সোপানে পা দেয়ার আশা জাগায়।

মানতে হবে যে, আমরা যৌথভাবে বিজ্ঞান চর্চা করতে ও তার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে প্রযুক্তির ওপর দখল ও তা ব্যবহার করে পুঁজি গঠনে আমরা পিছিয়ে গেছি। একদিকে মেধা-অভিবাসন রোধে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, তেমনি রেমিট্যান্সের প্রাচুর্য্যের নেতিবাচক প্রভাব থেকে স্বদেশের পুঁজিকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারিনি। (বরং অসহায় শ্রমিককে দেশান্তর করে তাদের পাঠানো অর্থ নানাভাবে ব্যক্তিস্বার্থে আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছি।) এতসবের পরও আমি মনে করি, বহু বছর সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তার পর গত কয়েক বছরে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ দেখা গেছে। বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে। ওয়েবসাইটে তুলে দিয়ে আপাত গণপরামর্শের ভিত্তিতে অথচ নিঃশব্দে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতিও প্রণীত হয়েছে, যা আগত সমাজ ও রাজনীতির ধরনকে অনেকাংশেই বেঁধে দিচ্ছে। একদিকে যেমন শীর্ষ পর্যায়ে প্রাক-চিন্তাভিত্তিক (এবং স্ট্র্যাটেজিক) সিদ্ধান্ত লক্ষণীয়, তার উল্টোটি দেখা গেছে প্রয়োগে। বিশেষত প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় জবাবদিহিতার অভাবে। আজ তাই বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি না থাকলেও সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় প্রায়োগিক পর্যায়ে বহুধা-বিভক্ত কর্তৃত্ব বিরাজমান এবং এদের অনেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ক্ষমতা নির্বিশেষে আমরা ধারাবাহিকভাবে বহু বছর বিচারবিহীন হত্যা, গুম, ধর্মস্থানের অবমাননা ইত্যাদি অপকর্মের সাক্ষী হতে বাধ্য হয়েছি; যা আপাতদৃষ্টিতে কর্তৃত্ববিহীনভাবে সংঘটিত হয়েছে! তবে নেওমি ক্লাইনের 'দ্য শক থেরাপি' বইটির বর্ণনার সঙ্গে এসব ঘটনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি বারবার তার সৃষ্ট নিয়তির কাছে নতজানু হওয়ার জন্য আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে!

ভিন্ন আঙ্গিকে বললে, বাংলাদেশ ও এ উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডের রাজনীতি-অর্থনীতি এমন এক পথে পা বাড়িয়েছে, যেখান থেকে পিছুহটার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর প্রতিফলন ঘটছে যাতায়াত ব্যবস্থা ও অবকাঠামোয় এবং অধিক স্পষ্টতা পাবে যদি সেসব বাস্তবায়ন হয়। তবে সেই পথের অর্থনৈতিক রূপরেখা নাগরিক সমাজের কাছে রহস্যাবৃত— হয়তো অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকেরও অজানা! যতই অনুমাননির্ভর হোক না কেন, অন্তর্নিহিত অর্থনীতির গতিবিধি অনুধাবন প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনে অতীত পাপ মোচনের পদক্ষেপগুলো নিঃসন্দেহে জরুরি ছিল। তবে বিভেদকে জিইয়ে রেখে, অতীত গৌরবকে আঁকড়ে ধরে এবং সেই গরিমা থেকে বাড়তি খাজনা আদায়ে আত্মতুষ্ট থাকলে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব নয়। বরং বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে ঐক্যের ভিত রচনা করা জরুরি, যেন ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পথ থেকে এ ভূখণ্ড পিছলে না পড়ে। তাই আলোচনা ও বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত না করে আবারো যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে নজর দেব এবং তা থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করব। গত ৬ জুন তারিখে বণিক বার্তার 'প্রচ্ছায়া'য় আমার কিছু মত প্রকাশিত হয়েছিল ('যাতায়াত ব্যবস্থার দিকভাল'), যা পাঠকরা অনলাইনে পাবেন (http://www.bonikbarta.com/2015-06-06/news/details/38944.html)। সেসবের পুনরাবৃত্তি না করে সংক্ষেপে কিছু পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করব যাতায়াত ব্যবস্থায় উদ্যোগ এবং সেসবে অর্থনীতি ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্যতা নিয়ে। অনেক ভাবনাই দূরকল্পী মনে হবে। তবে সেসবকে ঘিরে আলোচনা যদি ঐকমত্য তৈরিতে সহায়ক হয়, সেটাই হবে বড় প্রাপ্তি।

অতীতের বর্ণনা থেকে আমরা দেখেছি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রায় তিন দশকজুড়ে ঢাকাকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে জেলা শহরের গুরুত্ব কমে উপজেলাগুলো জেলা শহরকে এড়িয়ে সরাসরি ঢাকার (বা চট্টগ্রামের) সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিক উন্নত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তীতে উপজেলাকে ডিঙিয়ে অনেক মহকুমা ও গ্রাম সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে তার প্রশাসনিক রূপরেখা বাস্তবায়ন নানা কারণে সম্ভব হয়নি (হয়তো কাঙ্ক্ষিতও নয়) এবং সে কারণে শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি দানা বাঁধেনি। এ যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত সড়কনির্ভর ছিল, যা বিভিন্ন এলাকার পণ্য পরিবহনের খরচে হেরফের এনেছিল। আজ এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, যমুনা-পদ্মার পূর্ব পাশ পশ্চিম পাশের তুলনায় অধিক উন্নত হতে পেরেছে মূলত স্বল্প দামে গ্যাস পাওয়ার জন্য। অথচ বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন-বিশ্লেষণে সেই মৌলিক বিষয়টি পাশ কাটিয়ে গেছেন (দারিদ্র্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের ওপর আমার গবেষণা প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (www.sajjadz.net)। সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি শ্রম চলাচল দ্রুত করে এবং রেলপথের অধোগতির কারণে এককালের উন্নয়নশীল জেলা শহরে পণ্য উৎপাদনের ও বাজারজাতের খরচ অধিক হওয়ায় সেখানকার উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে কর্মের অনুসন্ধানে সেখানকার মানুষ (শ্রম) বহির্মুখী হতে বাধ্য হয়। শুনতে খটকা লাগবে, উপজেলাভিত্তিক 'বিকেন্দ্রীকরণ' সার্বিক উন্নয়ন আনলেও কার্যত তা জেলা শহরকে দুর্বল করে কেন্দ্রকে অধিক শক্তিশালী করেছে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান ভূগোলকে গুনতিতে নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য প্রবাহের অর্থনীতিক বিশ্লেষণ করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার যুক্তির ধারাতে বলা সম্ভব, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্তি ও তার প্রভাবের ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত ফলাফলের সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ কোনো কোনো সংযুক্তির ফলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান হ্রাস পেয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মেধা, শ্রম ও অর্থ অধিক উন্নত দেশে পাচার হয়েছে (ও হচ্ছে)। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, বর্তমানের বাস্তবায়নে থাকা যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংযুক্তির ধরন কি সেই চিরাচরিত ধারাতেই চলছে? নাকি তার গুণগত পরিবর্তন আসছে?

এই পর্বের বাকি অংশে এবং শেষ পর্বে অতি সাধারণভাবে একটি প্রশ্ন তুলেছি। বিস্তৃত যাতায়াত খাতে আমরা যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে দেখছি, তাতে কি কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে? আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, সেসব কি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য পরিবহন বা রফতানির সহায়ক? যাত্রী ও শ্রমের চলাচলে সহায়ক? জ্বালানি ও কাঁচামাল পরিবহনের জন্য করা হচ্ছে? প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্টে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে? নাকি এক বা একাধিক স্বার্থের (বিনিয়োগ বা সামরিক) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে যাতায়াত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে? শুরুতেই বলেছিলাম, উত্তরে অসম্পূর্ণতা থাকবে এবং নিত্যপরিবর্তনশীল বাস্তবতায় তথ্য ও পর্যবেক্ষণ হালনাগাদ করা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।

সড়ক চলাচলে নতুন চুক্তি, ঢাকা-সিলেট-তামাবিল হয়ে গুয়াহাটি পর্যন্ত রাস্তা এশিয়ান হাইওয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করা হলেও এ পথ দিয়ে মোদি সরকারের পণ্য পরিবহনের পরিকল্পনা বাদ দেয়া, ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনবিশিষ্ট সড়ক তৈরিতে বিলম্ব, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মূল সংযুক্তি (সিলেটের পথে না হয়ে) আখাউড়া-আগারতলা এবং আগরতলা থেকে মেঘালয় পথেই সীমাবদ্ধ রাখার ভারতীয় পক্ষের আভাস, আশুগঞ্জে নৌ-টার্মিনাল স্থাপন, ফ্লাইওভারের প্রতি আধিক্য ও বিমানবন্দর থেকে জয়দেবপুর অবধি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনের ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা ও ফ্লাইওভারের প্রকল্প ইত্যাদি ইঙ্গিত দেয় যে কোন কোন চালিকাশক্তির চাওয়ার ধরন নিম্নরূপ: (১) স্থানীয় পণ্য উৎপাদন ও তার রফতানি সুগমে অনাগ্রহী, (২) আঞ্চলিক যাত্রী চলাচলে (বিশেষত পর্যটন) অধিক আগ্রহী এবং (৩) যাত্রীর আড়ালে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে (মূল ভূখণ্ডে) শ্রম অভিবাসন সুগমে আগ্রহী,(২) (যা বাংলাদেশীদের আঞ্চলিক চলাচলে ভিসা পেতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে)। (৪) সড়কপথে ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য পরিবহনে আগ্রহ সীমিত। তবে (খনিজ) সম্পদ পরিবহনের জন্য আগরতলা-কুমিল্লা-লাকসাম-চট্টগ্রাম রেল ও নৌ-রুটের প্রতি অধিক আগ্রহী। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-রাখাইন রুটে রেল ও সড়কপথে চীনা বিনিয়োগের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্পদের বাজার বিস্তৃত করার সুযোগ এনে দেবে।) (৫) ঢাকা-জয়দেবপুর সড়ক ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যমুনার চরের বালুতে দুর্লভ খনিজের সন্ধানে নেবে, নাকি যমুনার ওপর উপযুক্ত সেতুর অভাবে তা আরো বিস্তৃত হয়ে উত্তরপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (বাংলাদেশকে এড়ানোর) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইনস্টিটিউটের সুপারিশ খণ্ডন করে আঞ্চলিক সংযুক্তিতে বাংলাদেশকে মধ্যমণি করবে, তা অনুমানসাপেক্ষ।

পানিপ্রবাহে চীনের উত্তরমুখিতা এবং ভারতের পশ্চিমমুখিতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ইচ্ছুকদের হতাশ করেছে। সেসঙ্গে পূর্বে ব্যাখ্যা দিয়েছি, কেন উভয় উত্তরপথে এবং দক্ষিণাঞ্চল বরাবর গ্রিড লাইন স্থাপন-এর মুখ্য উদ্দেশ্য, পূর্বাঞ্চলের স্বল্প দামে তৈরি জলবিদ্যুৎ পশ্চিম ভারতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে এবং (অনুমান করা হচ্ছে) পশ্চিম বাংলার দক্ষিণে সমুদ্রবন্দর তৈরিতে ব্যবহার। এ প্রবাহে বাংলাদেশ কতটুকু ভাগ বসাতে পারবে, তা নিশ্চিত নয়। তবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে কেবল মংলা এবং ভেড়ামারায় ইকোনমিক জোন তৈরিতে ভারতীয় আগ্রহের প্রকাশ পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, আগামীতে বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ রফতানির সন্দেহের যৌক্তিকতা রয়েছে। এ অভিব্যক্তি বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদনে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অনাগ্রহেরও প্রকাশ। ভারতীয় চেম্বার-প্রতিনিধি দল অবশ্য পূর্বেই কেবল পর্যটনে তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছিল! অথচ মাতারবাড়ীতে বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপনে কোনো কোনো ভারতীয় কোম্পানির আগ্রহের কথা শোনা গেছে, যার ভিন্নতা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব। [চলবে]

টীকা: ১. দীর্ঘকালীন লাভক্ষতির ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা যখন বিদ্যুতের বর্তমান দাম বৃদ্ধি অথবা বহির্বিশ্বের জ্বালানি তেলের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারের নিয়ন্ত্রিত দাম কমাতে না চান, তখন সহজাত যুক্তির রাজ্যেও হোঁচট খেতে হয়।

২. সাধারণত যে এলাকা থেকে সম্পদ আহরণ ও স্থানান্তর হয়, সেখানকার মানুষকে (বহির্গমনের) অভিবাসনের অধিক সুযোগ দেয়ার চল রয়েছে। সিরীয় রিফিউজি পরিবারের দুটো শিশুমৃত্যু ঘটনার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে অভিবাসন কোটা বৃদ্ধি সদ্যকার ঘটনা। বাংলাদেশ হয়তো এর ব্যতিক্রম নয়।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক

ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)

বণিক বার্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি ও বিষয়বস্তু অন্য কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-মেইল: news@bonikbarta.com | বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯